ভুল থেকেই পলিথিন!

একটি ভুল থেকেই জন্ম দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত পলিথিনের। আবিষ্কারের শুরুর দিকে মোড়কজাতকরণের জন্য ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে এটি সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। দোকান থেকে বাজার, বাজার থেকে শপিংমল কিংবা হোটেল-রেস্তোরাঁ সকল স্থানে দেখা যায় পলিথিনের ব্যবহার। কিন্তু ভুল থেকে জন্ম নেওয়া পলিথিন আবিষ্কারের গল্পটা আমাদের কয়জনের জানা রয়েছে। পলিথিন আবিষ্কারের কথা জানাচ্ছেন ***শিশির আহমেদ****।*

এক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ২০১৭ সালের তথ্যানুযায়ী ১০ কোটি টন পলিইথিলিন রেজিন প্রতি বছর উৎপাদিত হচ্ছে এবং এটি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রথমে পলিথিন সাধারণ মানুষ গ্রহণ না করলেও এর স্থায়িত্ব এবং স্বল্পমূল্যের কারণে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সাধারণত পেট্রোলিয়াম থেকে পলিথিন উৎপন্ন হয়। পলিথিন অধিক ব্যবহারের ফলে পরিবেশ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। অধিক উৎপাদনের ফলে ক্ষতিকর পদার্থ পরিবেশে ভারসাম্যহীনতা তৈরি করছে। পলিথিন তৈরি করা হয় ইথিন নামক পলিমার বিক্রিয়ার মাধ্যমে। ইথিনকে ২০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় গরম করে, উচ্চ চাপের সাথে অক্সিজেন যুক্ত করলে অসংখ্য ইথিন অণু পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে দীর্ঘ শিকল বিশিষ্ট পলিমার অণু তৈরি করে। যা পলিথিন নামে পরিচিত।

১৯৩৩ সালে যুক্তরাজ্যের নর্থউইচের কাছে আইসিআই ওয়ালারস্কোট প্ল্যান্টের রসায়নবিদদের একটি দল পলিমারের উপর কাজ করছিল, তবে তাদের পরীক্ষার সময় তাদের ভুল হয়েছিল। তারা একটি সাদা মোমের মতো কিছু দেখতে পেয়েছিল যা পলিথিন নামে বেশি পরিচিত। পলিথিন আবিষ্কারের কৃতিত্ব দুই বিজ্ঞানীর এরিক ফসেট এবং রেজিনাল্ড গিবসন। যারা প্রথমে দুর্ঘটনাক্রমে ১৯৩৩ সালে এটি তৈরি করেছিলেন। তাদের এই গবেষণাটি করতে দীর্ঘ পাঁচ বছর লেগেছিল। আইসিআই এর রেকর্ড থেকে জানা যায় পলিথিন থেকে তৈরি প্রথম উপাদান ছিলো 'ক্রিম-রঙের ওয়াকিং স্টিক'। ১৯৩৮ সালে আইসিআই পলিথিন বৃহত্তরভাবে উৎপাদনের অনুমতি দেয়। পলিথিনের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। তখন রাডারের তার নিরোধক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেনকে দীর্ঘ-দূরত্বের বিমান যুদ্ধে একটি সুবিধা দিয়েছিল। যুদ্ধে পলিথিনের অসাধারণ সাফল্যের পর এটিকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হয়।

আজকের দিনে এটি খাদ্য প্যাকেজিং, ক্যারি ব্যাগ, প্লাস্টিকের পাইপ, বৈদ্যুতিক তারের নিরোধকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। পলিথিনের বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানীগণ এর বিকাশের পর থেকে গবেষণা শুরু করে। ১৯৫১ সালে রবার্ট ব্যাংকস ও জে পল হোগান দ্বারা আবিষ্কৃত ক্রোমিয়াম ট্রাইঅক্সাইডের উপর ভিত্তি করে এবং ১৯৫৩ সালে জার্মান রসায়নবিদ কার্ল জিগলার টাইটানিয়াম হ্যালাইডস এবং অর্গানোঅ্যালুমিনিয়াম যৌগের উপর ভিত্তি করে একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছিলেন যা তার চেয়েও হালকা অবস্থায় কাজ করে। এটি কম ব্যয়বহুল যার ফলে উভয় পদ্ধতিই ব্যাপকভাবে শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

১৯৯৩ সালে বাণিজ্যিকভাবে প্রথম পলিথিন উৎপাদন করে ইম্পেরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ। ইথিলিন এবং বেনজালডিহাইডের মিশ্রণে অত্যন্ত উচ্চ চাপ প্রয়োগ করার পরে তারা একটি সাদা, মোমযুক্ত উপাদান তৈরি করে। নতুন প্রযুক্তি হওয়ার কারণে শুরুর দিকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা কঠিন ছিল। তবে তারা ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে আইসিআই রসায়নবিদ মাইকেল পেরিন-এর প্রযুক্তি ব্যবহার করে কম ঘনত্বের পলিথিন উৎপাদন করে। এরপর ১৯৪৪ সালে টেক্সাসের সাবাইন রিভারে ডুপন্ট এবং পশ্চিম ভার্জিনিয়ার দক্ষিণ চার্লসটনে ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশন আইসিআই থেকে লাইসেন্স নিয়ে বড় আকারে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে।

পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের মধ্যে একটি পলিথিন, তবে সেই আবিষ্কার বর্তমানে দুঃস্বপ্নের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশৃঙ্খলভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ফলে বর্তমানে বাস্তুতন্ত্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। প্লাস্টিক তৈরি করা হয় জীবাশ্ম জ্বালানি, অপরিশোধিত তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস নিষ্কাশনের মধ্য দিয়ে। এরূপ অনবায়নযোগ্য শক্তি উৎসগুলোকে ইথিলিন ও প্রোপিলিন

পেতে ব্যবহার করা হয়। যার ফলে বায়ু মাটি পানি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও গ্রিনহাউজ গ্যাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় তো রয়েছেই।

আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন কেন্দ্রের তথ্যানুযায়ী, প্রায় ৯৯ শতাংশ প্লাস্টিকই আসে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে। শুধু ২০২০ সালেই বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক শিল্প থেকে ১.৮ বিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সমপরিমাণ গ্যাস নির্গত হয়েছে। যা ৩৮০টি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদনের সমান। প্রকৃতি থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের পর সেগুলোকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, যার কারণে পরিবেশে ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি জল সংকট দেখা যায় ও বিপুল পরিমাণ কার্বণ নিঃসরণ করা হয়। প্লাস্টিক সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় প্যাকেজিংয়ের ক্ষেত্রে। এলেন ম্যাক আর্থার ফাউন্ডেশনের মতে, শুধু প্লাস্টিক প্যাকেট উৎপাদনেই ২০২০ সালে ১৪৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন প্রয়োজন হয়েছে। এই পরিমাণ বিশ্বব্যাপী মোট প্লাস্টিক বর্জ্যের প্রায় প্রায় ২৮ শতাংশ এবং তা আরো বাড়ছে।

প্লাস্টিকজাত দ্রব্যের বিস্তৃত ব্যবহারের মধ্যে থাকা একবার ব্যবহারযোগ্য পণ্য থেকে শুরু করে দীর্ঘস্থায়ী উপকরণ, সবই পরিবেশ ক্ষয় করছে। বর্তমানে এসব প্লাস্টিক রিসাইকেল করে নানারকম পণ্য তৈরি করা হলেও তা খুবই সামান্য। বিশাল পরিমাণের প্লাস্টিক বর্জ্য গিয়ে জমা হয় ভাগাড়ে, যেগুলো পচতে হাজার বছর সময় লাগে। এ ছাড়া অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ফলে বড় পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্যের গন্তব্য হয় জলাশয়। যার ফলে জলজ প্রাণীর মৃত্যু ও সমুদ্র দূষণ আরও বৃদ্ধি পায়।

প্লাস্টিক দূষণে বাংলাদেশেও পিছিয়ে নেই। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের (বাপা) হিসাব অনুযায়ী, শুধু ঢাকায় প্রতিদিন প্রায় দুই কোটি পলিথিন ব্যাগ ও ২৪ হাজার টন প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হচ্ছে। তবে ঢাকাসহ সারা দেশে পলিথিনের ব্যবহার কমিয়ে আনতে আইন পরিবর্তনের পাশাপাশি বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বেশকিছু উদ্যোগের কথা শোনা গেলেও বাস্তবে তার কোনো সুফল দেখা যায়নি। বাংলাদেশ সরকার প্লাস্টিক দূষণ রোধে ৫০ শতাংশ প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করলেও মাত্র ২০ ভাগ পুর্নব্যবহার করা হয়েছে। অতিরিক্ত প্লাস্টিক বর্জ্যের ফলে নালা ও ড্রেনের পানি জমে থাকছে যার ফলে এডিস মশার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হচ্ছে বাংলাদেশ।

প্লাস্টিক বর্জ্যের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে পরিণত হয়েছে সমুদ্র। যার ফলে এর সামুদ্রিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল মানুষজন এর পরিণতি দেখতে পাচ্ছে। জাতিসংঘের পরিবেশ প্রোগ্রামের (ইউএনইপি) পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ৮ মিলিয়ন এর বেশি মেট্রিক টন প্লাস্টিক বর্জ্য প্রতি বছর সমুদ্রে প্রবেশ করে। এই প্লাস্টিক দূষণ সামুদ্রিক প্রাণীদের জন্য বিশাল হুমকির রূপ নেয়, কেননা তারা প্রায়ই ভুল করে প্লাস্টিককে খাবার মনে করে বা বিভিন্নভাবে তাদের শরীর প্লাস্টিকের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। এছাড়াও ভূমি ও মাটি দূষণ হচ্ছে পলিথিনের মাধ্যমে। প্লাস্টিক তৈরির মূল উপাদান পাওয়া যায় মাটি থেকেই। এসব উপাদান উত্তোলন করার নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় যা মাটিকে বিভিন্নভাবে দূষিত করছে। প্লাস্টিক বর্জ্য মাটিতে ফেলার কারণে উদ্ভিদ ও জীব উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও প্লাস্টিক দূষণের কারণে মাটির উর্বরতা ব্যাহত হয়। প্লাস্টিক বর্জ্য পুড়িয়ে ফেলার ফলে পরিবেশে বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ মিশে যায়, বিশেষ করে কার্বন ডাই অক্সাইড।

পলিথিনের জন্য সামুদ্রিক পরিবেশ বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বর্তমানে এটি গ্রিনহাউজ গ্যাস বৃদ্ধির মূল কারণ, এছাড়াও অন্যসব পদার্থের কারণে বায়ুজনিত নানা রোগব্যাধি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্লাস্টিক দূষণের সবচেয়ে ভয়ের দিকটি হচ্ছে এর দীর্ঘস্থায়িতা। প্লাস্টিক পচনে বহু বহু বছর কেটে যায়। তবে এতেই শেষ নয় এর পচনের পরও একটি মাইক্রোপ্লাস্টিকে রুপ নেয়, যার আকার ৫ মিলিমিটারের চেয়েও কম। বায়ু থেকে শুরু করে সমুদ্রে সব জায়গায় এর উপস্থিতি বর্তমানে রয়েছে। এসব মাইক্রোপ্লাস্টিকের ছোট ছোট কণা শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি করছে। আশার বিষয় হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৫০টি দেশের সাথে বৈঠক করেছে এবং শ্রীলঙ্কা নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে খাদ্যপণ্যের 'ওয়ান টাইম প্যাক' বানানোর জন্য ব্যবহৃত স্টিরিওফোম; জৈব পদ্ধতিতে পচানো যাবে এমন ব্যাগ ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে চীন। এছাড়াও প্লাস্টিক সম্পর্কিত সকল পণ্য কঠোরভাবে বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং রিসাইকেল সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রণোদনা দেওয়ার আহ্বান করা হয়েছে।

আমাদের দেশে সোনালি ব্যাগ নামক এক ধরনের ব্যাগ রয়েছে যা পাট থেকে উদ্ভাবিত ব্যাগ। বাংলাদেশি বিজ্ঞানী মোবারক আহমদ খান এটি উদ্ভাবন করেছেন। যা সেলুলোজ-ভিত্তিক বায়োডিগ্রেডেবল বায়োপ্লাস্টিক। এটি প্লাস্টিক ব্যাগের একটি বিকল্প। বাংলাদেশ সরকারের উচিত এই ব্যাগ ব্যবহারের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। সকলের উচিত হবে নিজেদের পরিবেশ রক্ষার জন্য এই ধরনের উদ্যোগে অংশগ্রহণ করা।